বর্ণমালা

জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ পত্রিকা

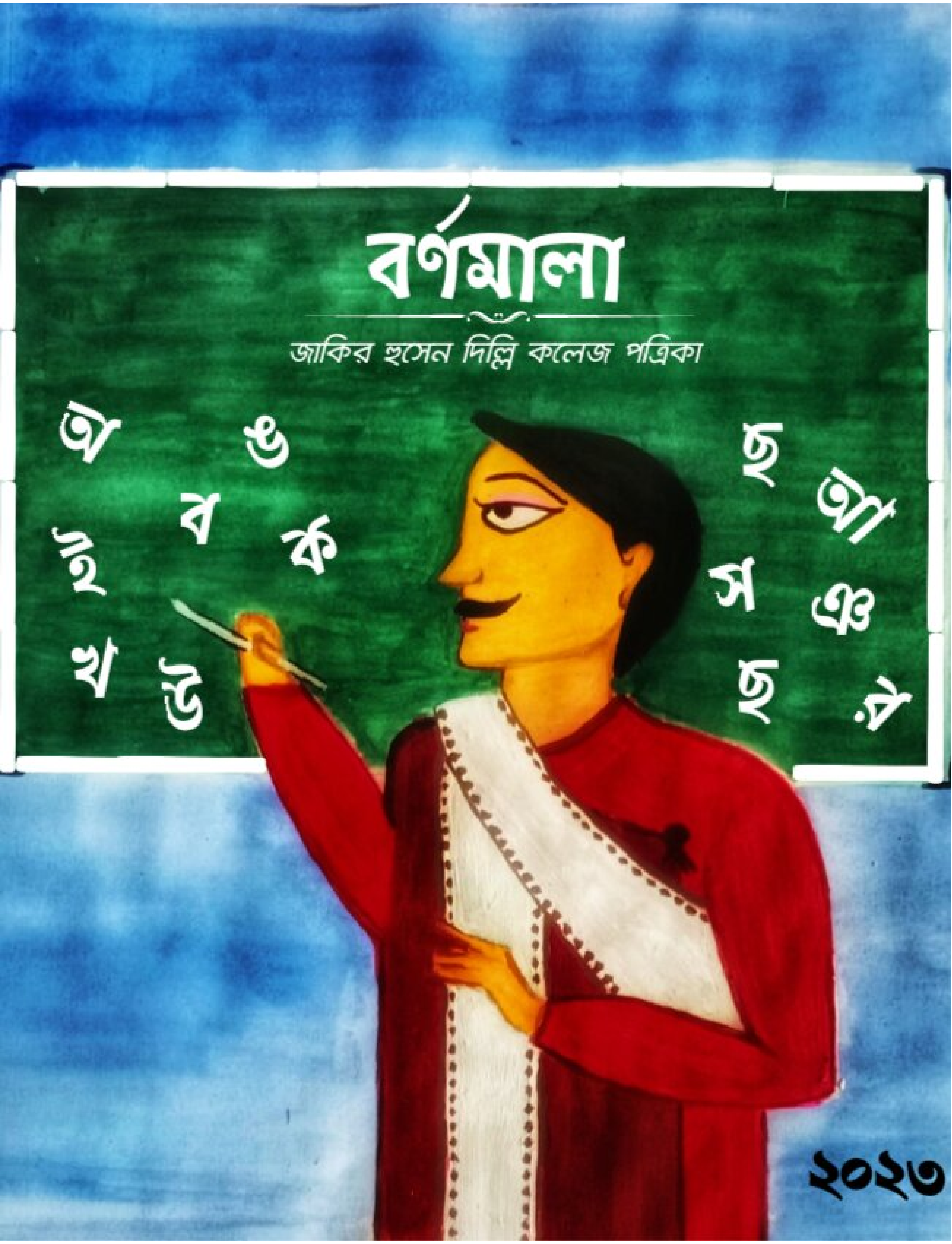
ঐ
ঙ
ব
ক
ঈ
খ
ঊ
ছ
ঔ
স
ঞ
ছ

২০২৩

‘BARNAMALA’

(Annual Journal of Department of Bengali, Published by Prof. Narendra Singh, Principal, Zakir Husain Delhi College, 2023)

বাংলা বিভাগীয় বার্ষিক পত্রিকা জাকির হুসেন দিল্লি কলেজের পক্ষে অধ্যক্ষ ড. নরেন্দ্র সিং কর্তৃক প্রকাশিত।

(Bengali magazine published by Prof. Narendra Singh, Principal, Zakir Husain Delhi College.)

সম্পাদক:

সম্রাট হেমব্রম

প্রচ্ছদ:

নৈসর্গিকা দাস

টাইপিং:

ড. শর্মিষ্ঠা সেন

ড.হিমাদ্রী শেখর হাওলাদার

সম্পাদকীয়

দেশব্যাপী 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' পালিত হচ্ছে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে। ভারতীয় অন্যান্য শাখা ও প্রতিষ্ঠানের সমান্তরালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নানাবিধ কার্যক্রমের দ্বারা সেই প্রয়াসের সম্পৃক্ততায় বিশেষ অংশীভূত অবদানে অনবরত সাক্ষী থাকার পাশাপাশি ক্রমাগত নতুন ইতিহাস গড়ছে। বিশ্ববাসী'কে নতুন আশ্বাসে আহ্বান বার্তা- 'ওয়ান আর্থ, ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান ফিউচার'। সহমর্মিতায় একসঙ্গে আগামী পথ চলার অঙ্গীকার। হয়তো এখানেই অমৃত, এখানেই মুক্তি, এখানেই স্বাধীনতা!

জাকির হোসেন দিল্লি কলেজের বাংলা বিভাগ পরিচালিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য গোষ্ঠী' কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'বর্ণমালা'; সেই অংশেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বর্ণমালা ২০২৩ সংখ্যায় কলেজের বাংলা বিভাগের তিনটি বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক মণ্ডলীর সাহিত্যচর্চা ও স্বাধীন চিন্তনের নানাবিধ পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের লিখনে। মৌলিক সাহিত্যচর্চায় নবরসের স্বরূপ -এর সমান্তরালে বাঙালির সমাজতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতায় অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর পাশে স্থান পেয়েছে ছোটগল্পে জীবন সংগ্রামের প্রত্যক্ষ, জলজ্যান্ত চরিত্র। অপর একটি প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে, পরাধীনতার গরল উগরে দিয়ে স্বাধীনতার অমৃত পানের ইতিকথা। ব্যাকরণে বাক্য সংবর্তন ও নতুন বাক্য গঠনে অধোগঠন(ডীপ স্ট্রাকচার) ও অধিগঠন(সারফেস স্ট্রাকচার) -এর দৃঢ় বন্ধনে সজ্জিত এইবারের 'বর্ণমালা' সংখ্যা'টি।

বর্ণমালা'র প্রস্তুতিপর্বে অনবরত মূল্যবান পরামর্শ চেয়ে বারবার বিরক্ত করেছি শর্মিষ্ঠা ম্যাডাম, অদ্বিতী ম্যাডাম, হিমাদ্রী স্যার'কে। যাঁদের পরামর্শ ছাড়া কখনোই সম্ভব হতো না -এই **'বর্ণমালা'** গাঁথা। বর্ণমালা'র প্রচ্ছদ প্রস্তুত করেছে আমাদেরই স্নাতক-প্রথম বর্ষের ছাত্রী, নৈসর্গিকা দাস। বিদায়ী তৃতীয় বর্ষ ও নবাগত প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রী সকলে পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত; তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। তাঁরা আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। যদিও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা অসমীচীন। আমি সেই রীতিও লঙ্ঘন করলাম!

বাংলা বর্ণমালা যেমন বাংলা লিখতে, পড়তে শেখায় অথবা বাংলাতে নিয়ম মেনে পাঠক্রমে পথ চলতে শুরুর কথা বলে; তেমনি আগামীতে বৃহৎপরিসরে সৃজনশীলতা, মূল্যবোধ ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুতের অ, আ, ক, খ পর্ব এই বিভাগীয় পত্রিকা; '**বর্ণমালা**'।

বঙ্গীয় সাহিত্য গোষ্ঠী'র পক্ষে
সম্রাট হেমব্রম
২ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		
বাঙালি কেন কখনোই সমাজতন্ত্র আনতে পারবেনা: আহমদ শরীফের একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে	শর্মিষ্ঠা সেন	1-3
শব্দের জগৎ	হিমাদ্রী শেখর হাওলাদার	4-5
জীবন যুদ্ধ	সুমনা গুছাইত	6
আলোর স্বপ্ন	সাহানাজ সুলতানা	7
সমান্তরালতা	নৈসর্গিকা দাস	8-9
উৎসাহ	নৈসর্গিকা দাস	10-11
নবরস	নৈসর্গিকা দাস	11-13
বাক্যের আন্বয়িক গঠন	সম্রাট হেমব্রম	14-22
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি	জিসিকা পারভিন	23-24
মন আবেশি	হিমাদ্রী শেখর হাওলাদার	25
বঙ্গীয় সাহিত্য গোষ্ঠী: গত দু-বছরের কার্যবিবরণী		

বাঙালি কেন কখনোই সমাজতন্ত্র আনতে পারবেনা: আহমদ শরীফের একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে

শর্মিষ্ঠা সেন

অধ্যাপক

আহমদ শরীফ (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ - ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) ছিলেন ও-পার বাংলার একজন স্বনামধন্য ভাষাবিদ ও প্রাবন্ধিক। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন সৈনিক। তাঁর জীবন কেটেছে এ-পার বাংলায়। আহমদ শরীফ বড় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর কাকা-- বিখ্যাত পুঁথি-সংগ্রাহক এবং বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। পিতৃব্যের দুর্লভ, অমূল্য পুঁথির ভাণ্ডার ও সাময়িক পত্রপত্রিকার সম্ভারের মধ্যে ছিল তাঁর বিচরণ। তাই বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান আহরণের অনুসন্ধিৎসা ছিল। অধ্যাপনার মধ্য দিয়েই পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন তিনি। কিছুদিন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সহকারী হিসেবেও কাজ করেছেন। আবার পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় তিনি ব্যয় করেছেন মধ্যযুগের সাহিত্যিক ও সামাজিক ইতিহাস রচনার জন্য। আহমদ শরীফের সমাজ-দর্শনের সঙ্গে আমাদের আরো বেশি পরিচিত হওয়া দরকার।

বাঙালির সামাজিক ইতিহাস রচনার একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়,আহমদ শরীফ রচিত 'বাঙালীর মনন চর্চার বৈশিষ্ট্য' নামের একটি প্রবন্ধে। 'বাঙালীর মনন চর্চার বৈশিষ্ট্য – প্রবন্ধটি আহমদ শরীফ ১৯৭৪ সনের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ দর্শন সম্মেলনে, শাখা-সভাপতির ভাষণ হিসাবে লিখেছিলেন। আসলে চল্লিশের দশক থেকেই বঙ্গভূমির এপার-ওপার—দুইপারেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসৃত হয়ে চলেছিল। সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের কথাই সবসময়ে বলেছে। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সব মানুষের মধ্যে সমতা আনার আদর্শ অবিভক্ত বঙ্গভূমির মানুষেরও ছিল। বরং ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জায়গার আগে বাঙালিই সাম্য – সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। কিন্তু তা কতটুকু সম্ভবপর হতে পারে এই বাংলার সমাজে—অথবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব কী না, সেই প্রশ্নটি এই প্রবন্ধে তুলেছেন আহমদ শরীফ। মানুষের স্বাভাবিক-প্রবণতার সঙ্গে তার আদর্শের একটা ফারাক নেই তো? বাঙালি সমাজের সেই দিকটিও আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধটিতে।

আহমদ শরীফের এই প্রবন্ধটি কার্যকারণের সূত্রে ঘনসম্পৃক্ত। প্রাণীমাত্রেই বাঁচতে চায়। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার তার স্বাভাবিক প্রবণতা। তার দৈহিক প্রয়োজন। এরই জন্য সে খাদ্য-

সংগ্রহ করে, বাসস্থান সন্ধান করে এবং বংশবৃদ্ধিও করে। এটা তার সহজাত। আর নিজের বাঁচাকে আরো সুবিধাজনক করার জন্য মানুষ এমনকী আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি । পাহাড় কেটে সমতল করে কীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা যায়, তার থাকার জায়গা কীভাবে আরো পোক্ত করা যায়, যাতায়াতের সুবিধার্থ পাকা রাস্তা নির্মাণ, ক্রমশ যানবাহন আবিষ্কার, যোগযোগের সুবিধার জন্য দূরভাস যন্ত্রে খবরাখবর নেওয়া, প্রচন্ড দাবদাহ থেকে মুক্তির জন্য ক্রমে শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র আবিষ্কার করা – এসব সে করে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, যে সব জায়গায় বুদ্ধিমান ও উদ্যমী মানুষ ছিল, জীবনযাপনের দিক থেকে সেই সব জায়গায় মানুষ বেশি উন্নতি করেছে।

অন্যদিকে, যা-কিছু মানুষ বুঝতে পারে নি, তাতে সে অসহায় বোধ করেছে। সেই সব জিনিসকে সে ভয়-ভক্তিতে পূজা করেছে। আর এইভাবে মানুষের ইতিহাসে অন্ধবিশ্বাসেরও জন্ম হয়েছে। অন্ধবিশ্বাস থেকে এক ধরণের ভিত্তিহীন আদর্শবোধ ও দর্শনেরও সৃষ্টি হয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ নানারকম প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করেছে। সূর্য, অগ্নি, বরুণ, রাত্রি—এরা আসলে প্রাকৃতিক দেবতা। তার কারণ মানুষ নানা সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পেয়েছে। ঝড়ের দাপট বা বন্যা থেকে বাঁচার জন্য সে জলদেবতা নির্মাণ করেছে। বরুণের পূজার মধ্য দিয়ে সেই ভয়কে জয় করতে চেয়েছে। অজানা রাত্রির অন্ধকারকে ভয় পেয়ে তাকে পূজা করা, দাবানলের ভয়ঙ্করতাকে বঅনুভব করে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করা-- পূজা করা, যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হওয়া—মানুষের এই সব বিশ্বাস আমাদের বুঝিয়ে দেয় মানুষের অজ্ঞতা থেকে তার অন্ধবিশ্বাসের জন্ম। আহমদ শরীফের মতে, এই যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসগুলিই ক্রমে শাস্ত্র হয়ে উঠেছে। যে কোনো ধর্মের ক্ষেত্রেই এ-কথা সত্য।

মানুষের বাঁচার দৈহিক প্রয়োজন বা ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়া আর এক রকমের প্রয়োজন আছে। তা হল তার মনের ক্ষিধে, মননের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষ ছবি এঁকেছে, গান গেয়েছে, সাহিত্য রচনা করেছে। শিল্পসংস্কৃতি এই প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি হয়। বিকাশের ধারায় মানুষের জীবন যত জটিল হয়ে উঠেছে, ততই তার শরীরের চাহিদা আর মনের চাহিদা ভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এক দিকে গ্রহাভিসারী যন্ত্র(স্পুটনিক, অ্যাপোলো, কলাম্বিয়া প্রভৃতি) চালিয়ে সে তার বহির্বিশ্বকে জানার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে জীবন কী, কেন, কী আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, কোনো উদ্দেশ্য তার আছে কী না—এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সে বিভিন্ন দর্শন গড়ে তুলেছে। অস্তিত্ববাদী এবং অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্ব মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসারই একরকম উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

তবে, ধর্মচর্চাই হোক, বা দর্শনচর্চা—বাঙালী যে কারণে যা-ই গড়ে তুলুক না কেন, লক্ষণীয়—যে তা সমাজ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সৃষ্টির গোড়ার দিকে যখন হিন্দু বা মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল, তা ছিল সকলের জন্য। অনেক মানুষ সম্বলিত সমাজকে একটা শৃঙ্খলায় আনার জন্য। মানুষ যাতে কিছু নিয়ম-নীতির দ্বারা অনুশাসিত হয়, অরাজক না হয়ে ওঠে, তার জন্য। কিন্তু, ক্রমে, যত আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হল, মানুষের নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে সন্ধান করার কথা বলা হল, ততই মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল।এই দর্শন আহমদ শরীফের নিজস্ব। তিনি লক্ষ্য করেছেন, মানুষ যতই নিজেকে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা বলে মনে করেছে, তত সে ঈশ্বরকেও নিজের মধ্যে সীমিত করে দিয়েছে। এই ভাবে এক সময়ে হিন্দু তার ধর্মকে আলাদা করে নিল। মুসলমান হিন্দুকে তার ধর্মে জায়গা দিল না। এমন বিভাজিত সমাজে কখনো সাম্য আসতে পারে না।

আবার বাঙালী ভোগ বাসনা ত্যাগ করার কথা বারবার বললেও, সেটা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ, সে স্বভাবতই ভোগবাদী। দেহবাদী। ভোগ করে তবে ত্যাগ করার কথা সে বলেছে। সশরীরে স্বর্গলাভ তার আকাঙ্ক্ষা। দেহ ছাড়া কোনো স্বর্গলাভের সাধনা বাঙালির অভ্যাসে ছিল না কখনোই। তাই আমাদের ধর্মপ্রচারক বা দার্শনিক—যারা দেহকে বাদ দিয়ে অধ্যাত্মচর্চার কথা বলেছিলেন, তাঁরা জাতিকে ভুল পথে চালনা করছেন—এইটি লেখকের বক্তব্য। তাঁর মতে, এটি করতে গিয়ে আমরা স্বভাবকে অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছি। আমরা সমাজকে অগ্রাহ্য করে এমন এক সাধনায় বসেছি, যেখানে সামাজিক জীবনেকে অগ্রাহ্য করা যায়। আমরা, ফলে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছি আরো বেশি।

বাঙালী যদিও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে এসেছে অনেক দিন ধরেই, এটা বাস্তবায়িত করা হিন্দু বা মুসলমান—কারো পক্ষেই সম্ভব না। কারণ লেখক দেখেছেন, আমরা প্রথমে হিন্দু,বা মুসলমান, তার পরে বাঙালী। আমরা একে- অপরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা যতদিন করব, যতদিন কেবল নিজের আত্মোন্নতির পথ খুঁজব, ততদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

আজকের সমাজের দিকে চাইলে সুদূর ১৯৭৪ সনে লেখা আহমদ শরীফের এ-সব কথার অনেকটাই সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আহমদ শরীফের তীক্ষ্ণ মেধা ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের আরো বেশি পরিচিত হওয়া দরকার।

শব্দের জগৎ

হিমাদ্রী শেখর হাওলাদার

অধ্যাপক

ভালোবাসা তার সমুদ্রের ঐ
পাড়ের গ্রামের মতো
দেখা যায় না কিন্তু আছে অনুভবে
পৃথিবী গোল বলে কোথাও বসবাস

রাতের আঁধারে তারা দেখা
একি স্থানে সবগুলো দেখা যায় না
কোন এক তারা হয়তো আজ দেখা গেলো
কারণ আজই তার মৃত্যু দিন ছিল

বর্ণগুলো শব্দ হয়ে বাক্য গড়ে
ছড়িয়ে পরে বকুল ফুলের গন্ধের মতো
প্রেমিকের হৃদয় সন্তানের মুখে
গায়কের গলায় কবির চেতনায়
গল্পাকারে প্রাবন্ধিক নেতার ভাষায়
গবেষকের চুলচেরা বিশ্লেষিত হয়ে
আজ ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে

চাঁদে মঙ্গলে ভিন্ন নক্ষত্র জগতে

গোটা একটি সভ্যতা গড়েছে

এই শব্দের ভিড়ে – তোমার অজান্তে

এতক্ষণ তুমিও বিচরণ করেছ –

আর ভাবছ-

এই শব্দের জগতে।

জীবন যুদ্ধ

সুমনা গুছাইত

স্নাতক, প্রথম বর্ষ

সেই দিন বাবার রিটায়ার হওয়ার দিন ছিল। আমি সন্ধ্যার দিকে বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার সময় বাবার সাথে দেখা হয়ে গেল। তাই দুই জন এক সাথে টোটো করে বাড়ি ফিরছিলাম, তখন বাবা বলল; 'রিটায়ার করে গেলাম'। এবার তো তোকে কিছু একটা করতে হবে। বোনের বিয়ে-থা তো দিতে হবে। আমার পেনশনের এই ক'টা টাকা দিয়ে কি আর সংসার চলবে!

আমি মোবাইল দেখতে দেখতে বললাম, আমার দ্বারা কিছু হবে না বাবা।

'টিউশন শুরু কর' বাবা বললো।

"ধর! বোরিং কাজ"। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

'ফাস্ট ফুডের দোকান করলে, ভালো চলবে'। বাবা উৎসাহ নিয়ে বলল।

আমি তখন বললাম, আমার হাতের রান্না কি আর অত ভালো, একজন লোক রাখলে তাকে তো কত টাকা দিতে হবে আর নিজের কী বাঁচবে।

ডেলিভার বয়ের কাজটা কিন্তু... বাবাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, আরে থামো তো। অত স্কুটি চালালে কোমরের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।

বাবার সাথে কথা বলতে বলতে কখন ঘরের সামনে এসে পড়েছি বুঝতে পারিনি। টোটো থেকে নেমে টোটোওয়ালা'কে টাকা দেওয়া সময় দেখি তার দুটো পা নেই। তবুও সে কেমন ক্র্যাচ নিয়ে জীবন'কে জয় করে এগিয়ে চলছে।

তাকে দেখে আমার চোখ খুলে গেল। ভগবান আমাকে হাত-পা সবই দিয়েছে, তাও আমি কিছু না করেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। তার হাত-পা না থাকা সত্বেও সে সৎ পথে থেকে সংসার চালনার জন্য টোটো দ্বারা টাকা উপার্জন করছে।

আলোর স্বপ্ন

সাহানাজ সুলতানা

স্নাতক, দ্বিতীয় বর্ষ

ইচ্ছে করে রকেট চড়ে

চাঁদের মাটি আনতে,

ইচ্ছে করে সদাই মনে

আলোর দিশা জানতে।

ঘরে আলো, বাইরে আলো

আলোয় জীবন ভরা,

সবুজ সবুজ স্বপ্নগুলো

আলোর নোলক পরা।

এই জগতে, যেথায় যত

আলোর উৎস আছে,

ঠিকানা সব থাকুক লেখা

হৃদয় খাতার কাছে।

যেথায় যত আঁধার আছে

আকাশ কালো করা,

দূর করে দিক সবাই মিলে

আলোর শিশু যারা।

সমান্তরালতা

নৈসর্গিকা দাস

স্নাতক, প্রথম বর্ষ

হাইওয়ের চার লেন
কতো গাড়ি চলে যায়।
রিকশা, সাইকেল...
ফুটপাথ ধরে যায়।

চার পেয়ে অন্ধ,
মুখ সব বন্ধ।
দু'পেয়ের হাহাকার,
করে তারা চিৎকার।

আর তার দুই পাশে
আছে এক বস্তি।
থাকে যারা দুই ধারে
নেই কারো স্বস্তি।

বস্তি’তে থাকে যারা
নয় যেন মানুষ তারা!
তাদের জীবন হায়
চিন্তায় কেটে যায়।

বস্তি’র লোকগুলো,
চোখে কারো ঘুম নাই।
কীভাবে জ্বালায় চুলো?
দুরূহ টাকা কামায়।

গাড়িতে যারা চাপে
তাদের কী দোষ ভাই?
গতিমান জীবনে
থামার যে জো নাই।

উৎসাহ

নৈসর্গিকা দাস

স্নাতক, প্রথম বর্ষ

তখন ঘড়ির কাঁটায় সবে সাড়ে দুটো বাজে, মা'কে বললাম "মা, খাবার দাও সাড়ে দুটো বাজে।"

"ওটা আড়াই'টে। ইনি আবার বাংলা নিয়ে পড়ছেন"

আমি দেড়, আড়াই পৌনে, সোয়া ইত্যাদি আরো যা সময়সূচক শব্দ আছে কোনটাই মুখস্থ, কণ্ঠস্থ কিছুই করতে পারিনা। কিন্তু যারা আড়াইটে বোঝে, তারা সাড়ে দুটো বোঝেনা, -এ আমি বিশ্বাস করিনা।

যাই হোক্, দুপুরের খাওয়া সেরে ফোন খুলেই দেখি স্যারের মেসেজ এসেছে – "আমাদের বিভাগীয় পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাও সকলে। সোমবারের মধ্যে পাঠিয়ো"।

কী লিখব এই ভাবতে ভাবতে দু'দিন চলে গেল। লেখকদের মতো এলেম যে আমার নেই;

-এতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

আজ সোমবার। পত্রিকার জন্য লেখা আজই জমা দিতে হবে। এদিকে কী লিখব সেটাই বুঝতে পারছি না। জোর করে কবিতা লিখলে সে আবার একটা মজার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, সাহসও আমার নেই। কিন্তু লেখার আগ্রহ তো আছে, এটা আমি অস্বীকার করতে পারছিনা। যতই হোক কলেজের প্রথম বছরের ছাত্রদের উৎসাহ একটু বেশিই থাকে।

আগা-গোড়া ভেবে যা বুঝলাম তা এই যে আমার মগজাস্ত্রে জং ধরেগেছে, আর এই জং সারানোর তেল দুদিন ধরে খুজলেও পাওয়া যায় না। শেষ অবধি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে নিজের নামটা পত্রিকায় দেখতে হলে যা-হোক কিছু লিখতে হবেই। তাই নিতান্তই বেহাল হয়ে এই দু'চারটে লাইন লিখলাম। এবার এটা ছাপানো হবে কিনা জানিনা। হলে আপনারাও

পড়বেন, কলেজের প্রথম বছরের এমন এক পড়ুয়ার কথা যে উৎসাহী হলেও কী করবে বুঝতে পারে না।

নবরস

নৈসর্গিকা দাস

স্নাতক, প্রথম বর্ষ

১) শৃঙ্গার

রাধা যেরূপ কৃষ্ণ প্রেমে
অভিসারের পূর্বে সাজে।
মানুষ আজও ঠিক তেমনি
মিলন পূর্বে সজ্জা করে।

প্রেম মিলনের পূর্বে যখন
সুরূপ সাজের সময় হয়।
রতি মূল ভাব হয়ে
শৃঙ্গার রসের জন্ম দেয়।

২) হাস্য

বন্ধুরা সব একসাথে,
আনন্দের আজই দিন।
কৌতুকের বই পড়লে,
হেসে পেটে ধরবে খিল।

বিজ্ঞানীরা রোজই বলেন,
এর চেয়ে ভালো ওষুধ নেই।
হাস্য রসে মত্ত থাকলে,
মোক্ষ লাভ এক জীবনেই।

৩) করুন

মানব জাতি কর্মে ব্যস্ত,
কর্মফলের প্রত্যাশায়।
ভুলেছে ভালোবাসা,
মানবতা ভুলেছে হায়।

জীবনের আজব খেলায়

দ্বন্দ্বে মরে আপন ভাই।
জীবন শেষে শোক করলে,
করুণ রস প্রকাশ পায়।

৪) বীর

বিরাট পর্বতের সম্মুখীন
হলেও যেন থেমো না।
সমুদ্র পারী দিতে
হলেও কিন্তু থেমো না।

ভগবান আছেন সঙ্গে
ভয়ে তুমি করছো কি?
বীর রসকে স্থান দাও,
সদা থাকো উৎসাহী।

৫) রৌদ্র

পার্বতীর শব দেখে
ক্রুদ্ধ হলেন শিব শংকর।
রুষ্ট হয়ে শব তুলে
নৃত্য করিলেন তাণ্ডব।
এমন একটি ভাবের প্রকোপ
থামানো প্রায় অসম্ভব।
রৌদ্র রস প্রকাশ পায়
ক্রোধ যদি হয় মূল ভাব।

৬) ভয়ানক

চারিদিকে অন্ধকার
এ কেমন নিবিড় বন।
আকাশও মেঘাচ্ছন্ন,
ঘন-ঘন করে গর্জন।

বাঘ-সিংহ, সাপ-বিছে,
এদের তো আর কমতি নেই।
ভয় যদি হয় মনের কোনে,
ভয়ানক রসের প্রকাশ সেই।

৭) বীভৎস

কাক পক্ষী অপেক্ষায়
কখন মৃত হাতে পায়।
চক্ষু দুটি সুস্বাদু,
এই তার অভিপ্রায়।

শিয়াল এখন এক এক করে
মৃতটির মাংস খায়।

শকুনও খাওয়ার জন্য
মৃতটির অন্ত্র পায়।

এই দৃশ্য দেখে কেমন
মনে তীব্র ঘৃণা হয়।
এমন সময় মানব মনে
বীভৎস রস প্রকাশ পায়।

৮) অদ্ভুৎ

জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ,
সবই কেমন ছন্দ হায়।
চর-অচর অখিল ভুবনে,
শ্রী হরির কোন লীলায়।
এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র?

ব্রহ্মাণ্ড কেমন কায়?
এ চৈতন্যের সন্ধানে,
অদ্ভুৎ রস প্রকাশ পায়।

৯) শান্ত

কর্ম শেষে, দিনান্তে,
মানুষ একটু শান্তি চায়।
কেউ নিদ্রায়, কেউ বা ধ্যানে,
এ সুখের সন্ধান পায়।

বৈরাগ্য, নির্বেদ
মূলভাব যদি হয়।
মধুরতম, নবম রস,
শান্ত রস প্রকাশ পায়।

বাক্যের আন্বয়িক গঠন

সম্রাট হেমব্রম

অধ্যাপক

ভাষাবিজ্ঞানের ভাবনা চিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন বিশ শতকের বরেণ্য ভাষা বিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি। স্যসুরের গ্রন্থের প্রায় তেতাল্লিশ বছর পরে প্রকাশিত তাঁর সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার ‘Syntactic Structure’, ১৯৫৭ গ্রন্থে ভাষার সংগঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধ্বনি রূপকে তিনি প্রাধান্য দিলেন না। স্যসুরের ভাষার ‘ডাইয়াক্রনিক‘(Diachronic)আর ‘সিনক্রনিক’ (Synchronic) এই দুটিকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

চমস্কি তত্ত্বে প্রাধান্য পেল অন্বয় বা সিনট্যাক্স (syntax), বীজ বাক্যের প্রসঙ্গ ও এল। ডাইয়াক্রনিক (Diachronic) চর্চা হল ভাষা বিজ্ঞানের দ্বিকালিক বা বহুকালিক চর্চা। আর সিনক্রনিক ভাষা বিজ্ঞানের এক কালিন চর্চা। যেখানে একটি নির্দিষ্ট কালের ভাষার ধ্বনি, রূপ, এবং অন্বয়ের অন্তর্গত পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে চমস্কি ‘লা লাং’ আর ‘লা প্যারোল’ কে মান্যতা দিয়েছেন তাঁর ‘Aspect of the Theory of Syntax’1965 গ্রন্থে। তিনি এখানে আলোচনায় মূল শব্দ আনলেন ‘Linguistics competence’ এবং ‘Linguistics performance’ ভাষা ভাষির সহজাত ভাষিক ধারণা আর পারঙ্গমতা হল ভাষা আর তাঁদের মুখে উচ্চারিত ভাষার ব্যবহারিক রূপটি হল উপভাষা। প্রথমটি হল ভাষার অবতল বা অধোগঠন (Deep structure), যা ভাষার অর্থের তল এবং দ্বিতিয়টি অধিতল বা অধিগঠন (Surface structure), ভাষার ধ্বনিগত রূপ (dialect) অর্থাৎ যা আমাদের উচ্চারিত হয়।

সঞ্জননী ব্যাকরণের সূত্র অবলম্বনে সংবর্তনের সূত্র তৈরি করেছেন চমস্কি। এটি কোনো একটি বাক্যের সংবর্তন নয়। এটি বিমূর্ত সূত্র। তাই বাক্যের যে গঠনটি তৈরি হয় সেটিও বিমূর্ত। এই কম সংখ্যক বিমূর্ত গঠন দিয়ে অধিক সংখ্যক অধিগঠন তৈরি করা যায়। এই সূত্র দিয়ে পৃথিবীর যেকোনো ভাষার বাক্য সঞ্জনন করা সম্ভব হয়। তাই এটি ভাষাবিজ্ঞান সম্মত তত্ত্ব হিসেবেই বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এই সূত্র প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন,

“In the derivation of a particular sentence, a transformational rule applies to an abstract representation of this sentence and transforms it into another abstract representation.”[8]

সংবর্তন হল এমন একটি ভাষাবিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি, যেখানে দুটি স্তরের আন্বয়িক গঠনের প্রকাশরূপ লাভ করা যায়। উক্ত দুটি স্তরের মধ্যে সম্পর্ক থাকবে।

আধুনিক ভাষাবিদ ডঃ উদয়কুমার চক্রবর্তী, বাক্যের আদর্শ যুক্তিনিষ্ঠ গঠনের ক্ষেত্রে চমস্কি প্রদত্ত দুটি স্তরকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি বাংলা বাক্যের আদর্শ অধোগঠনের গঠন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চমস্কি’র সুত্রকে মেনে নেননি। কারণ –

বাংলা বাক্যে AUX. কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়না। সেই জন্য ‘সহায়ক’ উপাদানটিকে অধোগঠনের ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত উপাদান হিসেবে দেখেছেন। “বাংলা বাক্যের গঠন S V O হিসাবে হয়না, S O V -এর মতো হয়। তাই NP^2 বাক্য গঠনের শেষে না রেখে ক্রিয়া’র আগে রাখতে চেয়েছেন ($NP^1 + NP^2 + V + AUX$)।“[৫]

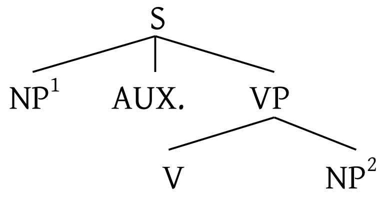

চমস্কি প্রদত্ত গঠন

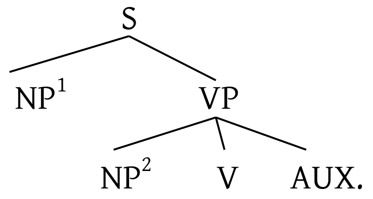

ডঃ উদয়কুমার চক্রবর্তী প্রদত্ত গঠন (বাংলা বাক্য)

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সংবর্তন হয়ে থাকে। পরিণাম অনুযায়ী এইসব সংবর্তন চারটি বর্গে সাজানো যায়।

ক. বাক্যের উপাদানগুলির স্থান বদল (Extraposition)।

খ. বাক্যের একটি উপাদানের বদলে আর একটি উপাদান স্থাপন (substitution)।

গ. বিলোপন (Deletion) জাতীয় সংবর্তন।

ঘ. যোগ বা উপাদান যোগ (Addition) জাতীয় সংবর্তন।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত লোধাদের ভাষায় সমাজ ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক বাক্যের সংবর্তন বিশ্লেষণ নিম্নরূপ-

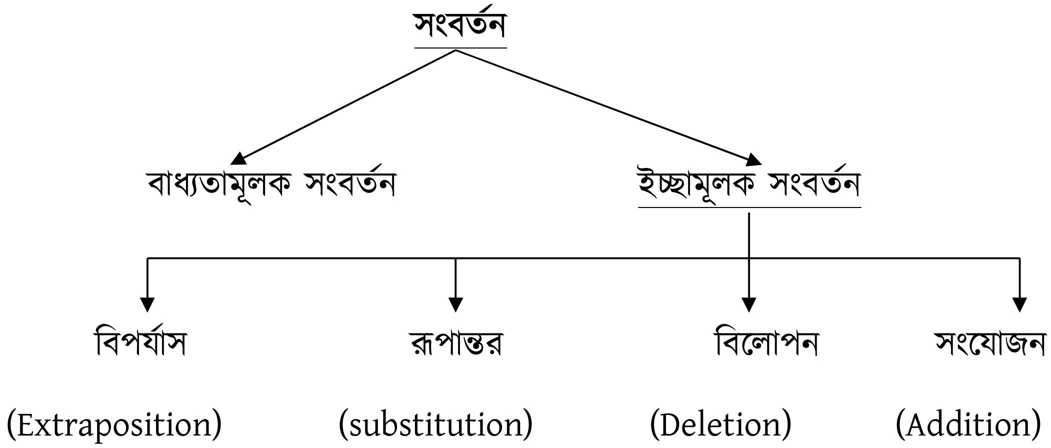
সংবর্তন
বাধ্যতামূলক সংবর্তন
ইচ্ছামূলক সংবর্তন
বিপর্যাস
(Extraposition)
রূপান্তর
(substitution)
বিলোপন
(Deletion)
সংযোজন
(Addition)

বিপর্যাস– বাক্যের উপাদান যখন নির্দিষ্ট কোনো জায়গা থেকে ভিন্ন জায়গায় চলে যায় তখন তাকে বিপর্যাস বলা হয়।

রূপান্তর– বাক্য সঞ্জননের সময় বাক্যের একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য একটি উপাদানের ব্যবহার যে পদ্ধতিতে ঘটে তাকে বলা হয় রূপান্তরণ।

বিলোপন– বাক্যের যে গঠনটি তৈরি হবে, তা থেকে কিছু উপাদান বাদ বা মুছে ফেলাকে বিলোপন বলা হয়। ডঃ উদায়কুমার চক্রবর্তী'র মতে, এই বিলোপনের অন্তরালে যে বিষয়টি রয়েছে তা হল মনস্তাতাত্ত্বিক দিক অর্থাৎ 'সমাজ-মনস্তত্ত্ব' গত দিক। ক্রিস্টাল(Crystal) একই মত পোষণ করেন।

> "Deletion transformations eliminate elements from the input structure."[৬]

সংযোজন– মৌলিক বাক্যগুলিকে যুক্ত করে একটি অ-মৌলিক বাক্যে পরিণত করাকে বাক্য সংযোজন বলা হয়। অর্থাৎ, অধোগঠনে একাধিক মৌলিক বাক্য যুক্ত হয়ে অধিগঠনের রূপ নেয়।

অধোগঠন - আমাদের জঙ্গল কাটা শেষ হবার পর, আমরা বনশনগর যাই।

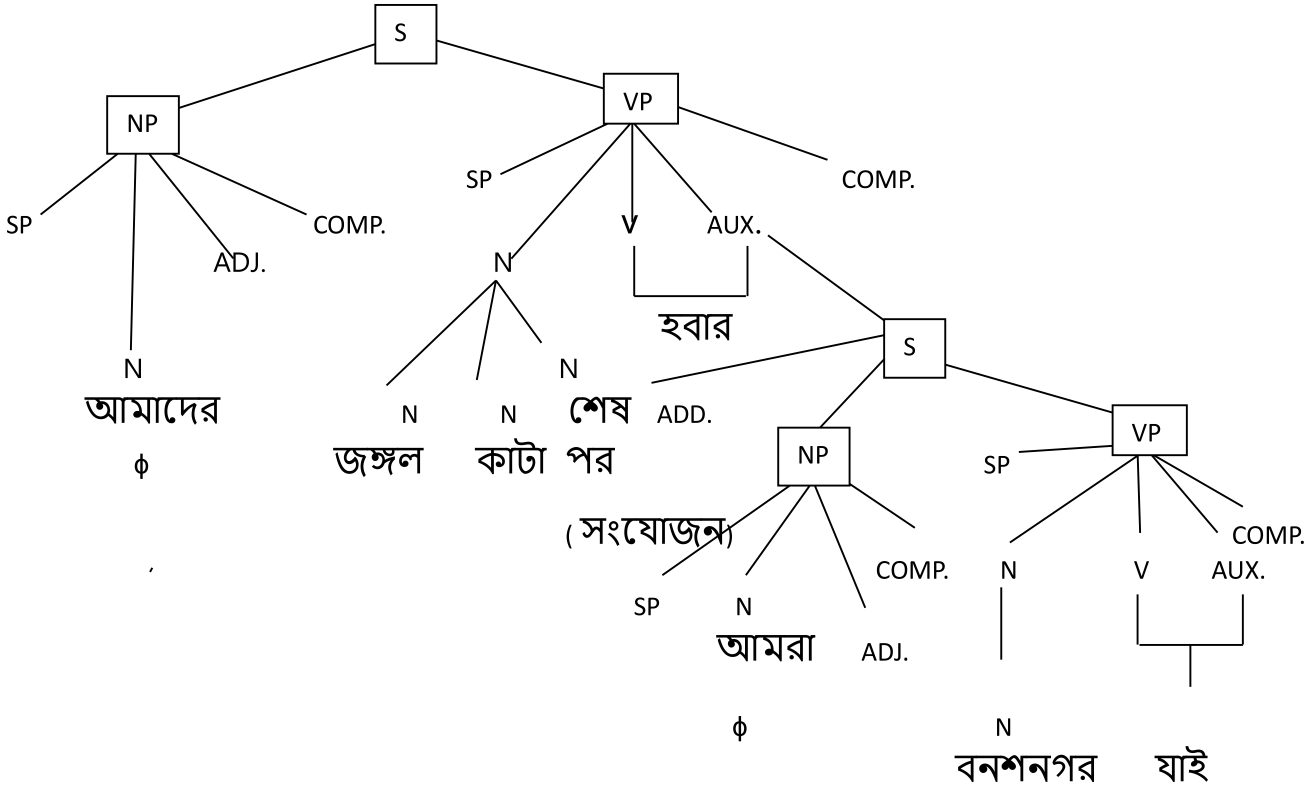
S
NP
VP
SP
COMP.
ADJ.
N
আমাদের
ϕ
SP
COMP.
N
V
AUX.
হবার
N
N
N
শেষ
ADD.
জঙ্গল
কাটা
পর
(সংযোজন)
S
NP
VP
SP
N
COMP.
ADJ.
আমরা
ϕ
SP
N
V
AUX.
COMP.
N
বনশনগর
যাই

সংবর্তন-

কর্তা বিলোপন– ϕ (আমাদের, আমরা)

দুটি বাক্যের সংযোজন– (হয়ত)

অধিগঠন – জঙ্গল কাটা শেষ হবার পর বনশনগর যাই।

অধোগঠন– আমরা নিজেরাই পূজা করি।

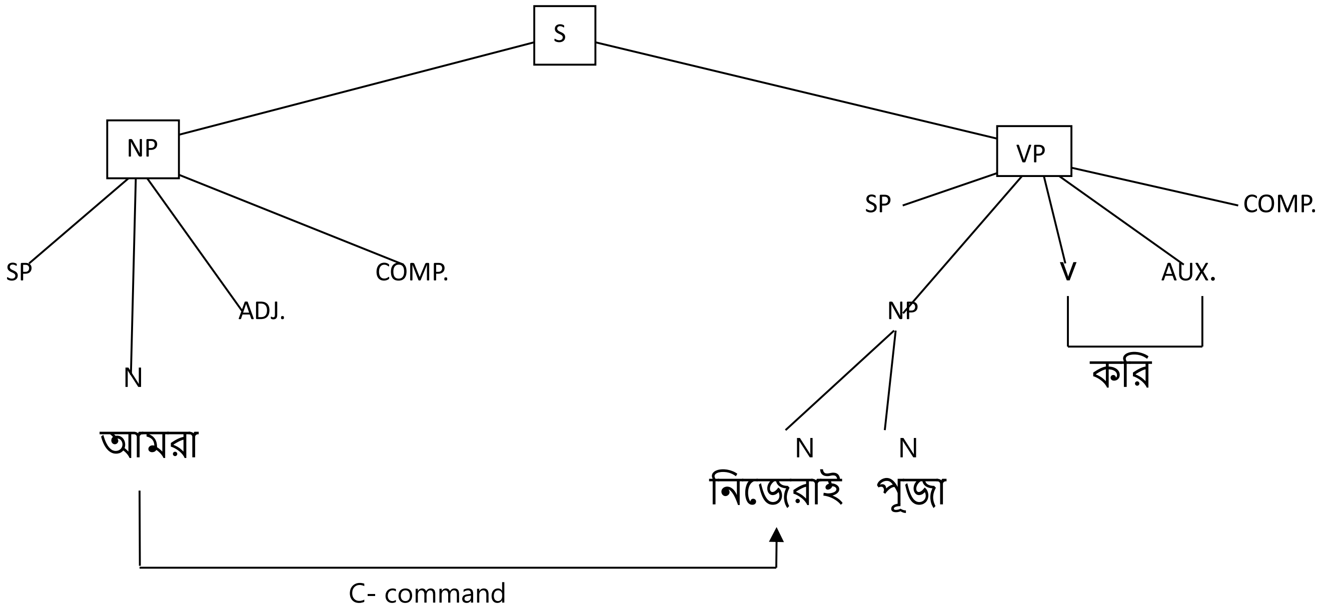
S
NP
VP
SP
N
ADJ.
COMP.
SP
COMP.
NP
V
AUX.
করি
আমরা
N
N
নিজেরাই
পূজা
C- command

সংবর্তন -

নিজেরাই – c – command (তারা নিজেরাই)।

অধিগঠন – **আমরা নিজেরাই পূজা করি।**

অধোগঠন – আমাদের জোঙ্গলে মাচ, কাঁকরা, মধু ভাঙ্গা হয়।

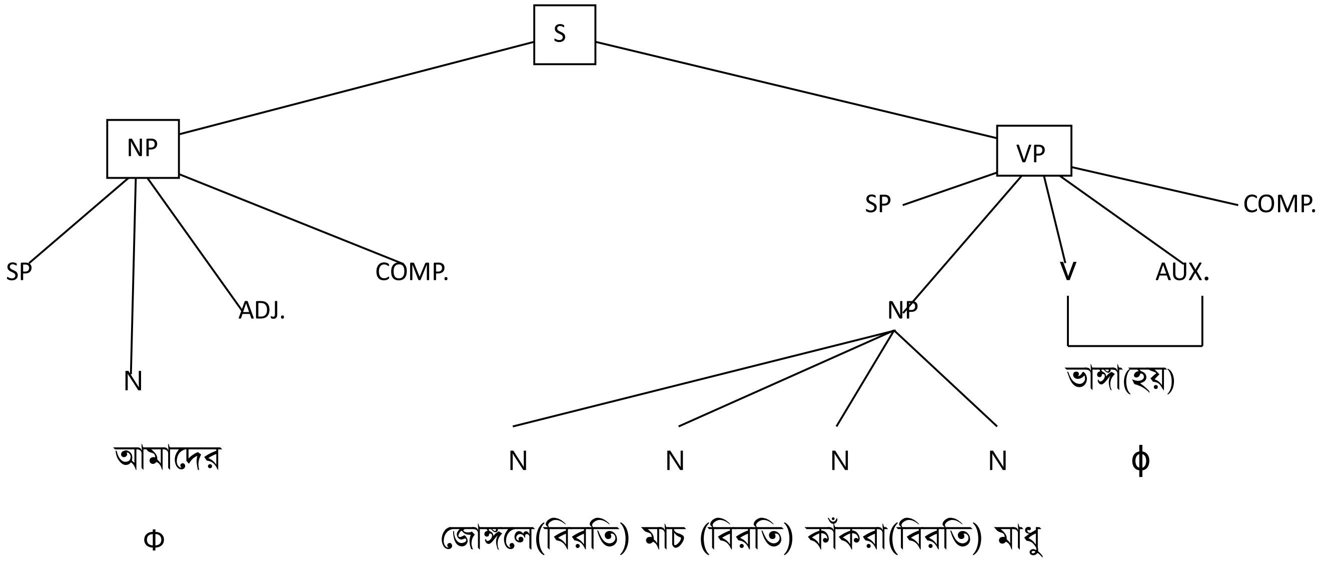
S
NP
VP
SP
N
ADJ.
COMP.
SP
NP
V
AUX.
COMP.
ভাঙ্গা(হয়)
আমাদের
N
N
N
N
ϕ
Φ
জোঙ্গলে(বিরতি) মাচ (বিরতি) কাঁকরা(বিরতি) মাধু

সংবর্তন–

কর্তা বিলোপন – ϕ আমাদের।

ক্রিয়া বিলোপন- ϕ হয়।

উপাদান সংযোজক - (,) বিরতি।

অধিগঠন – জোঙ্গলে মাচ, কাঁকরা, মধু ভাঙ্গা।

অধোগঠন– পাড়ার সবাই মাছ ধরে পূজার সময়।

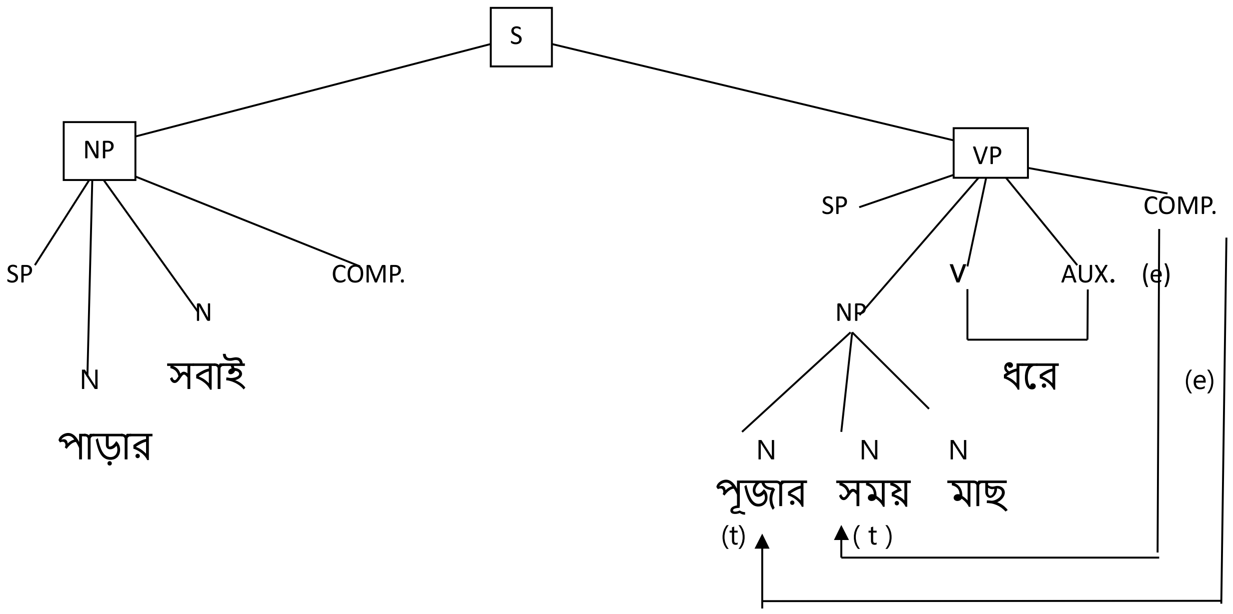
S
NP
VP
SP
N
N
COMP.
সবাই
পাড়ার
SP
COMP.
NP
V
AUX.
(e)
ধরে
(e)
N
N
N
পূজার
সময়
মাছ
(t)
(t)

α – movement

সংবর্তন–

t = trace

e = empty category

অধিগঠন – পাড়ার সবাই পূজার সময় মাছ ধরে ।

অধোগঠন – আমি ভোরে লৌকা লিয়া বারি যাই ।

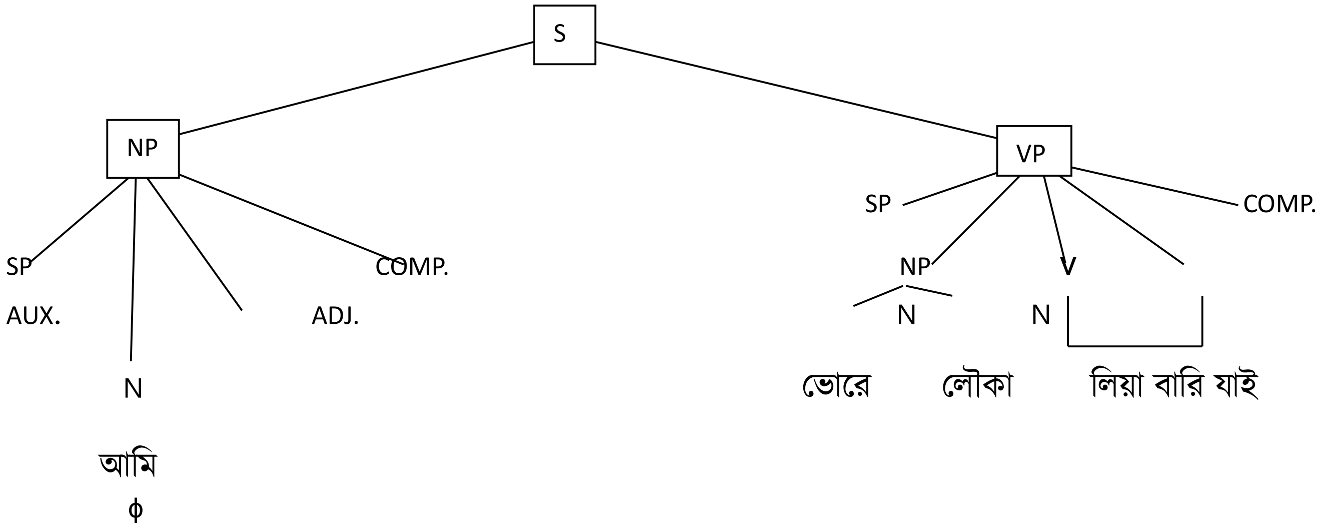
S
NP
VP
SP
AUX.
ADJ.
COMP.
N
আমি
ф
SP
COMP.
NP
V
N
N
ভোরে
লৌকা
লিয়া বারি যাই

সংবর্তন – কর্তা বিলোপন- ф আমি

অধিগঠন– ভোরে লৌকা লিয়া বারি যাই ।

অধোগঠন– ওনেক দিন ছাড়া ছাড়া ভাতা টাকা পাই।

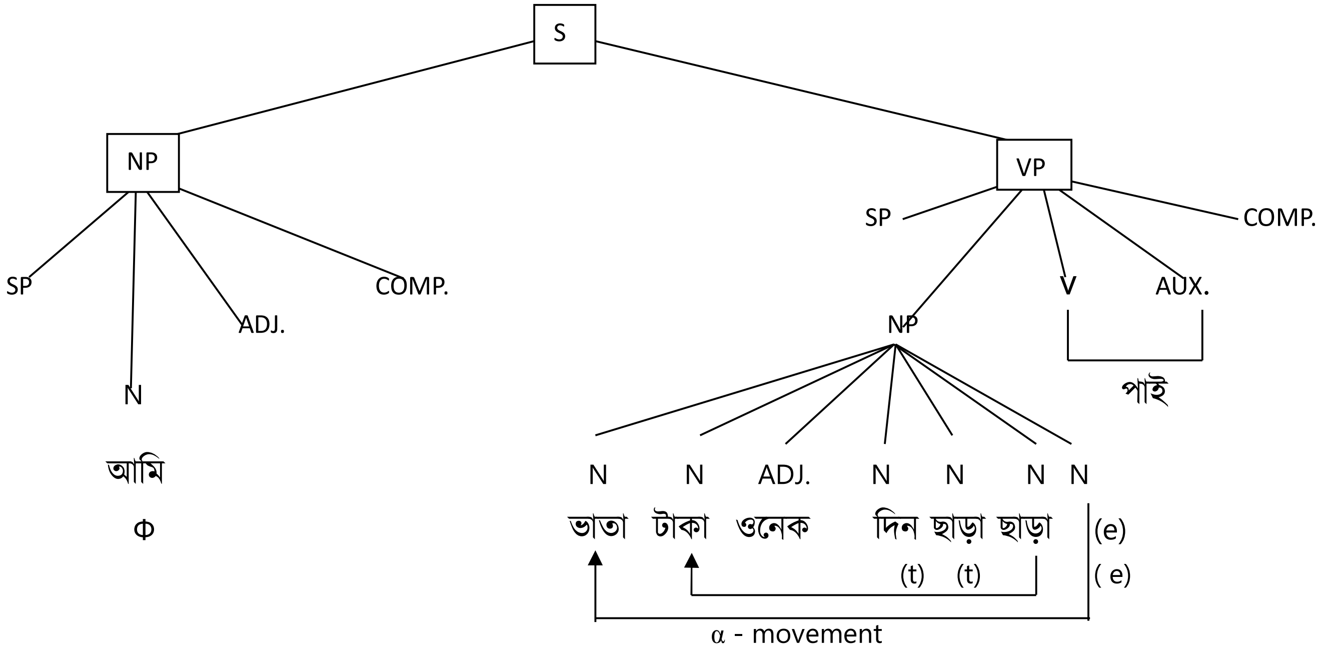
S
NP
VP
SP
ADJ.
COMP.
N
আমি
Φ
SP
COMP.
NP
V
AUX.
পাই
N N ADJ. N N N N
ভাতা টাকা ওনেক দিন ছাড়া ছাড়া
(e)
(t) (t)
(e)
α - movement

সংবর্তন– α- movement , কর্তা বিলোপন – ф আমি

অধিগঠন – ভাতা টাকা ওনেক দিন ছাড়া ছাড়া পাই।

অধোগঠন– উ বাড়িটা টা আমার জামাই বাড়ি ।

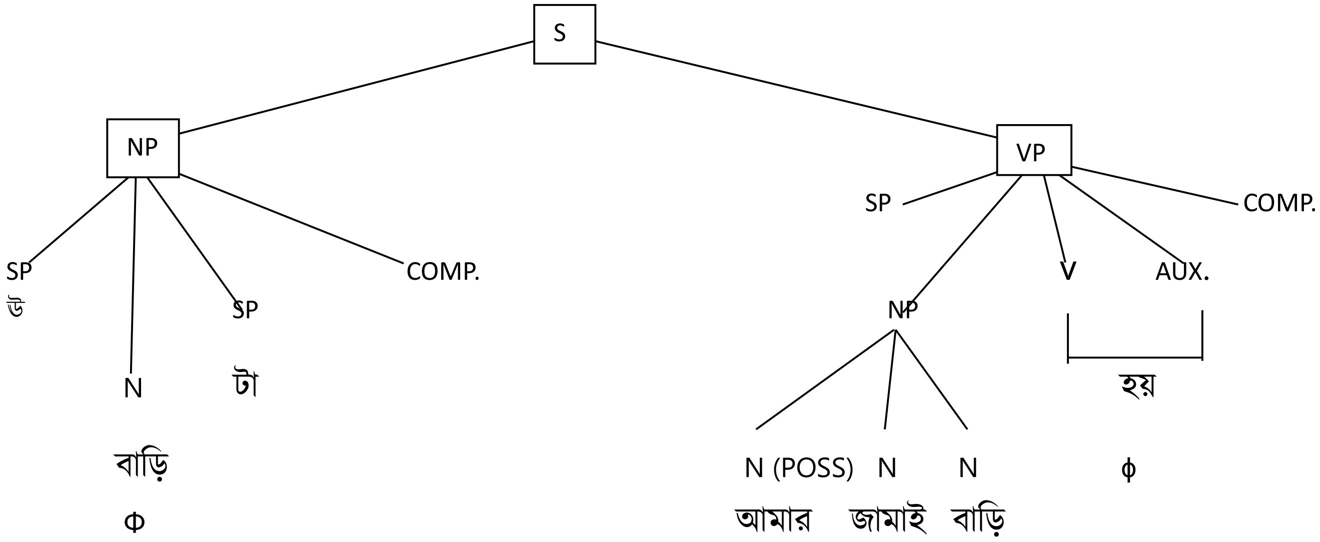
S
NP
VP
SP
উ
N
বাড়ি
φ
SP
টা
COMP.
SP
NP
N (POSS)
N
N
আমার
জামাই
বাড়ি
V
AUX.
হয়
φ
COMP.

সংবর্তন - কর্তা বিলোপন – φ বাড়ি, ক্রিয়া বিলোপন – φ হয় ।

অধিগঠন – উটা আমার জামাই বাড়ি।

অধোগঠন – তবু দ্যাশে লাচ লাগাবো ।

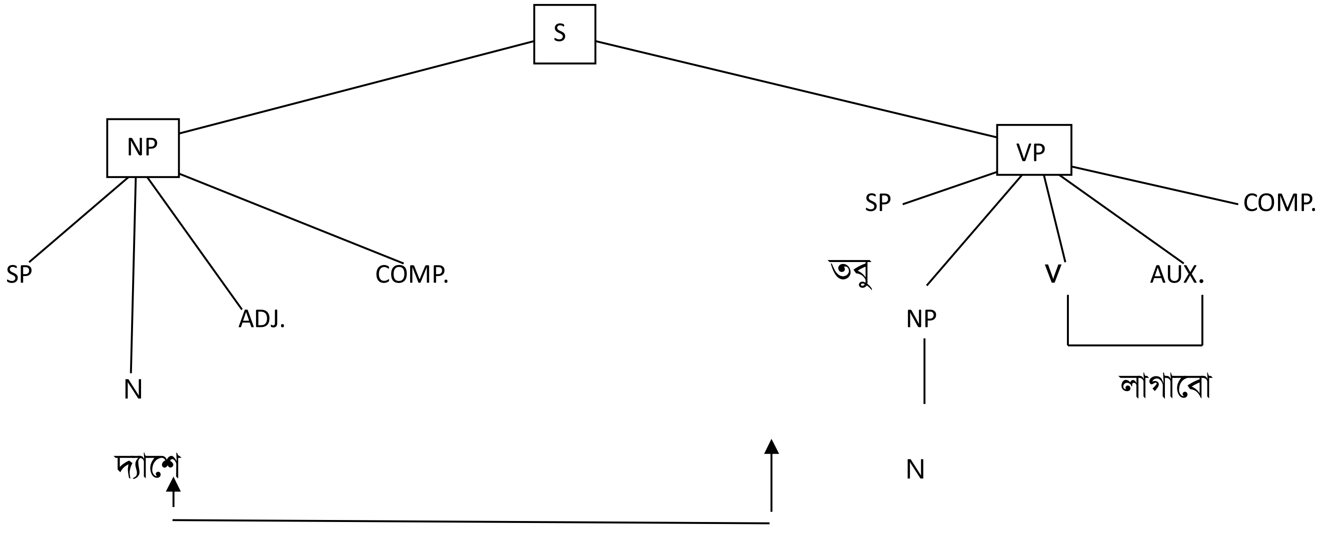
S
NP
VP
SP
N
দ্যাশে
ADJ.
COMP.
SP
তবু
NP
N
লাচ
V
AUX.
লাগাবো
COMP.

সংবর্তন – অবস্থান স্থানান্তরণ ও রূপান্তরণ

উচ্চারণ – **ন** > **ল**

অধিগঠন – দ্যাশে তবু লাচ লাগাবো ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি

জিসিকা পারভিন

স্নাতক, তৃতীয় বর্ষ

ভারতবর্ষ তার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস পালন করার জন্য তৈরি হচ্ছে আজ থেকে ৭৫ বছর আগে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশ রাজের শাসন থেকে স্বাধীন হয়েছিল তাই এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর আমরা স্বাধীনতা উদযাপন করি ভারত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যা আমাদের শিক্ষার অধিকার, কথা বলার অধিকার ছাড়াও আমাদের সকল অধিকার অনুসরণ করার স্বাধীনতা দেয়। প্রায় ২০০ বছর ধরে আমরা কুখ্যাত ব্রিটিশদের অধীনে ছিলাম। তারা আমাদের দাসের মতো ব্যবহার করেছে এবং আমাদের অর্থ ও সম্পদ ধ্বংস করেছে। আমাদের নানান ভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে কিন্তু দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ভারতীয়রা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ৭৫ বছর আগে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত অবশেষে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথমবারের মতো লালকেল্লায় ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন তারপর থেকে আমরা ভারতবাসী স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি। ভারতবর্ষ একসময় সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী প্রধান মসলা বাজারের জন্য পরিচিত ছিল। এই কারণগুলি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত দখল করার জন্য আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশটি ব্রিটিশদের অধীনে চলে আসে। তারা ভারতবাসীর উপরে নির্যাতন শুরু করে এবং আমাদের দাস ও গোলাম হতে বাধ্য করে বিভাজন ও শাসন নীতির সাহায্যে তারা ভারতীয়দের মধ্যে। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, জহরলাল নেহেরু, ভগৎ সিং, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, টিপু সুলতান, রানী লক্ষ্মীবাঈ ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁদের প্রেরণায় প্রত্যেক ভারতীয় কুখ্যাত ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে মহাআন্দোলনে শামিল হন। আর এভাবেই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের প্রাণের বলিদান দিয়ে আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের আজাদ ভারত উপহার দিয়েছেন। যার ফলে আজ আমরা স্বাধীনভাবে ভারতের মধ্যে শিক্ষা অর্জন করে শুরু করি নিজে নিজে ধর্ম পালনের মাধ্যমে হাজারো সুযোগ সুবিধার উপভোগ নিচ্ছি। তাই এই দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও

সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বীর শহীদদের স্মরণ করে এই দিনটিকে পালন করে। এই দিনে ভারতীয় হিসেবে আমাদের গর্ব করা উচিত এবং প্রতিশ্রুতি নেওয়া উচিত যে আমরা সর্বদা পরিপূর্ণ থাকব এবং আমাদের মাতৃভূমিকে যেকোনো ধরনের আগ্রাসন বা অপমান থেকে রক্ষা করার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা মাধ্যমে একটি অটুট বন্ধন তৈরি করব।

মন আবেশি

হিমাদ্রী শেখর হাওলাদার

অধ্যাপক

মাঘ মেলার জগৎ মিলন ভূমি
কতরা আসে ততরা যায়
এই জগৎ মেলায়

মন আবেশি নিত্য ধারা
দিয়েছিলে কবিতার বদ্ধ ভূমি
দিনের শেষে পরন্ত বারান্দায়
নয়ন তারা হেঁসে

কাগজের নৌকা
কেয়া পাতার নৌকা
দুঃখরাশি নিয়ে ভাসে
দ্রব্যগুণে স্থায়ী নাম লেখে
তবুও তারা ভাসে সংসারে
মুচকি হেঁসে ভালোবেসে।

বঙ্গীয় সাহিত্য গোষ্ঠী : গত দু-বছরের কার্যবিবরণী

কোভিদকালের বন্দী-দশা ঘুচিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যখন প্রাত্যহিক কলেজ জীবনে আসতে শুরু করেছে, তখন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য গোষ্ঠী সক্রিয়। ২০২০ সালে ৮ম গোপা দে স্মারক বক্তৃতাটি হওয়ার সময়টি (৬ই মার্চ, ২০২০) ছিল দুর্ভার। এক দিকে জাতিবিদ্বেষ আমাদের মানবসভ্যতাকে মিথ্যা প্রমাণ করে তার হিংস্র দাঁত, নখ বার করছে, অন্যদিকে অচেনা, অপ্রত্যাশিত ব্যাধি মহামারীর আকার নিয়ে মানুষকে খাঁচায় পুরে ফেলছে। তারই মধ্যে আকস্মিক লকডাউনে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী মানুষ বাধ্য হয়ে পথে নেমে বিপন্ন। সন্তান কাঁখে শ্রমিক নারীর ছবি একাকার হয়ে মিশে যায় দুর্গাপ্রতিমার কাঠামোয়। মানবিকতার আলতো ছোঁয়ায় কেঁপে উঠে বাঙালি তখন দেখছে, এখনো আশা আছে! অনেক প্রতিবেশী—অসংখ্য সোনার ছেলেমেয়ে বিপন্নের আর্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছুটেছে খাদ্য, ওষুধ, পথ্য, প্রয়োজনীয় পথ্য, হাসপাতালের ব্যবস্থা নিয়ে দুয়ার থেকে দুয়ারে। তবে সবটাই এমন সুখের ছবি ছিল না। মানুষের নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শনও কোভিদকাল আমাদের দেখিয়েছে। শিখিয়েছে, বাঁচার প্রয়োজনে আমাদের কতটুকুই বা নিত্য প্রয়োজন! প্রচণ্ড রোগভোগের পর স্বজনহীন জীবনে মানুষ আবার একটু একটু করে প্রকৃতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে বাঁচতে শিখছে। এখনো আমরা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি নি।

তবু তারই মধ্যে আমরা অনলাইন ক্লাসে অভ্যস্ত হলাম। এক মাউজ-ক্লিকে অন্তর্জালের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতবর্গের বক্তৃতামঞ্চে অংশীদার হতে শিখে নিলাম। লকজাউনের আগে ৮ম গোপা দে বক্তৃতাটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত দিল্লির বুকে ফল্গুধারার মতো সীমানাতিক্রান্ত সাহিৎয়ালোচনায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক দেবযানী সেনগুপ্ত। নবম বক্তৃতাটি হল আন্তর্জালিক মঞ্চে—বক্তা ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীলা বসু। বাংলার টেরাকোটা মন্দিরগাত্রের ফলকগুলির মধ্যেও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র কীভাবে ফুটে উঠেছে—বক্তৃতাটি ছিল সেই বিষয়ে। ২০২২শের ২৪শে ফেব্রুয়ারি এই সুন্দর বক্তৃতাটি সদ্য শেখা নতুন মাধ্যমে আমাদের কাছে এল। সভাধ্যক্ষ ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক গোপা দত্ত। শ্রোতার সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না।

কলেজ খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেমেয়েরা সমবেত হল রবীন্দ্র-দিবস উদযাপনে। পূর্বতন অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীমতী সঙ্গীতা পণ্ডিতার উৎসাহ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানের দিন(২৩শে এপ্রিল,২০২২) অধ্যক্ষ অধ্যাপক নরেন্দ্র সিং মহাশয়ের উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বর্ধন

করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মাল্যার্পণ ও দীপ-প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেছিলেন-- বিভিন্ন বিভাগের ও অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকরা, সম্মিলিতভাবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে নৃত্যগীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও ছাত্রছাত্রীদের আনন্দের নানা বর্ণ বিচ্ছুরণ ছিল লক্ষ্য করার মতো।

গত দু-বছরই ছাত্রছাত্রীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। উৎসাহ ছাত্রদের তরফেই ছিল বেশি—দেখে একটু গর্ব বোধ হয়েছে, বলাই বাহুল্য। যে শহরে মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগই বড় একটা মেলে না, সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে মাতৃভাষাকে ভেবে কিছু একটু করা আনন্দের বিষয়, বলাই বাহুল্য। ছাত্রছাত্রীরা ২০২২শে অনলাইনে এবং এবার অফলাইনেই স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ পাঠ, গান ইত্যাদির দ্বারা এই দিনটিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেছিল।

দশম গোপা দে স্মারক বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। ২৮শে এপ্রিল, ২০২৩। বক্তা- শ্রীযুক্ত সান্দীপনি ভট্টাচার্য অ্যামেটি গ্রুপ অফ ইন্সিটিটিউশনের অন্যতম ডাইরেক্টর। বক্তৃতা দিয়েছেন সিন্ধু সভ্যতায় অগ্নিপূজা বিষয়ে। খুব মনোজ্ঞ এই বক্তৃতাটি অনলাইন এবং অফলাইনে শুনেছেন প্রায় ২০০ জন শ্রোতা। ঋগ্বেদের অগ্নিপূজার (পুরুষ)থেকে হরপ্পা অঞ্চলের অগ্নিপূজার (স্ত্রী) ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি পাথুরে প্রমাণ দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী। শ্রদ্ধেয়া গোপাদির পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা, আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা, বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক --সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গোপা দে স্মৃতিপুরস্কারে ভূষিত হল প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই।

এছাড়া আনন্দের দিনগুলি ছিল নবীনবরণ ও বিদায়-সম্বর্ধনার দিন। এই দিনগুলির মধ্যে ২০২২শের বিদায় সম্বর্ধনা ছিল বিশেষ; কারণ, লকডাউন-কালীন বাধ্যবাধকতা ভেঙে ২০২০, ২০২১, ২০২২-এর বিদায়ী তিন দল ছাত্রছাত্রীকেই একত্র সমাবেশে সম্বর্ধনা জানানো হল। এই রকম সমাবেশ এই প্রথম। এ-সব দিন ছাত্রছাত্রীদের কলতানে মুখর ছিল যথারীতি।